হারাম

সেজান মাহমুদ

এক. বেগুনি স্বপ্নে নীল আগুন

’কত রাইত হইলো?’ ঘুম ঘুম ঘোরের আবেশ কাটতে না কাটতে প্রথমেই প্রশ্নটা মাথায় আসে। কেন আসে? রাত বাড়ার সাথে কিসের সংগতি? নাকি আরেকটা দিনের জন্য মনের গহীনে এই রাত বেড়ে যাওয়ার চিন্তা? এতো প্রশ্ন কেন মাথায় আসছে? নাকি মনের মধ্যে কোন অজানা ভয়ের জন্য রাতের অন্ধকার মগজের কোষে কোষে প্রশ্নগুলো জুড়ে দিচ্ছে?

হাত বাড়িয়ে ছেলে মেয়ে দু’টোর স্পর্শ অনুভব করে রাহেলা। অঘোরে ঘুমুচ্ছে। বহুদিন পর পেটপুরে খেয়ে কেমন শান্তির ঘুম। নিজেও কখন ঘুমিয়ে পড়েছে টের পায় নি। চারদিক কেমন শব্দহীন, নিঝুম লাগে। অন্যদিন তো এমন লাগে না। চারপাশে কত রকমের শব্দ থাকে। ঝি ঝি পোকা, পাখির ডানা, বাতাসে গাছের পাতায় পাতায় সংঘর্ষে কত বিচিত্র শব্দ তৈরি হয়। ঘুমই আসতে দেয় না। নাকি শরীরে পুষ্টির ছোয়া লেগে অবসন্ন মন, ক্লান্ত ইন্দ্রীয় উপেক্ষা করছে শব্দগুলোকে? এই কথাগুলোও ভালো করে গুছিয়ে ভাবতে পারে না রাহেলা। প্রতিদিনের ভাবনা জুড়ে থাকে কি খাবে, কি খাওয়াবে ছেলেমেয়ে দুটোকে। একবেলা, ও বেলা।

আল্লার দুনিয়ায় কি খাওয়া, পরা ছাড়া আর কিছু নাই? এই প্রশ্নটা শেষ হওয়ার আগেই যেন শুনতে পেলেন খোদাতাল্লা। দূত পাঠালেন রাহেলার কাছে। একি জিবরাইল নাকি আজরাইল? কার কি কাজ দুনিয়ায় ভাবার চেষ্টা করে পারে না রাহেলা। তারপর মনে হয় আজরাইল মানে মৃত্যুর দূত। রাহেলা ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে থাকে। কেমন আগুণের ফুলকির মতো জ্বলজ্বলে কিছু একটা তার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখ দুটোও কয়লা পোড়া আগুনের মতো চাপা চাপা জ্বলছে আর নিভছে। রাহেলা প্রাণপণে চিৎকার করে কিছু একটা বলতে চেয়েও পারে না। মনে হয় গলা দিয়ে কোন স্বর বের হচ্ছে না। চিৎকার করার চেষ্টা করতে করতে দম ফুরিয়ে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে কোথা থেকে যেন বাতাসের প্রচন্ড ঝাপ্টা এলো, বিকট শব্দে আগুনের কুন্ডলি ফেটে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

’দরজা খোলেন, দরজা খোলেন’

কেউ একজন জোরে দরজায় ধাক্কা দিয়ে শব্দ করছে। এতো রাতে কে, বা কারা? নাকি রাত বেশি হয়

নাই। রাহেলা ভ্যাবাচেকা ভাব কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে। এটা যে দুঃস্বপ্ন কোন আজরাইল না একথা ভেবে মনে মনে স্বস্তি পায় রাহেলা।

'কেডা?' সে কোনমতে জিগ্যেস করে।

'দরজা খোলেন, দরকার আছে, মুফতি সাব আমাদের পাঠাইছে'।

রাহেলার বুকে ধুকধুকানি শুরু হয়। একে তো দুঃস্বপ্নের ঘোরটা এখনও কাটে নি, তার ওপর ইতির বাপ বাড়িতে নাই। এই রাতবিরাতে মুফতি সাব কোন দরকারে ডাকে? ছেলে মেয়ে দুটো এখনও ঘুমিয়ে। রাহেলা তাড়াতাড়ি কাপড় ঠিকঠাক করে নেয়ার চেষ্টা করে। ফিন ফিনে পাতলা তাতের শাড়িটা যে কতদিনের পুরনো তা নিজেও জানে না। না ধুতে ধুতে ময়লায় ভারি ভারি লাগে। গায়ের ব্লাউসটারও একই অবস্থা। ছিড়ে গেছে কয়েক জায়গায়। ক'দিন আগে মাস কাবারি কামলা খাটতে যাওয়ার আগে ইতির বাপ বলছিল এবার মাস শেষে আসার সময় রান্ধুনী বাড়ির হাট থেকে একটা রেডিমেড ব্লাউস কিনে আনবে। মাস শেষ হতে এখনও অনেক দেরি। এই প্রথম ঘুম ভাঙ্গার পর রাহেলা খেয়াল করে যে বাইরে বাতাসের শব্দ গাছের পাতায় কেমন ফিসফিসানি আওয়াজ তুলছে। রাহেলা দরজা খোলে ভয়ে ভয়ে। ঘরে দরজা বলতে একখন্ড পাটশোলার বেড়া।

'কি হইছে?'

অন্ধকারে সবাইকে ভালো করে না চিনলেও ধীরে ধীরে চোখে অন্ধকার সয়ে আসে। তাছাড়া একজনের হাতে টিমটিমে হারিকেন। তিনজনের দলে সামনে দাড়ানো দক্ষিণ পাড়ার ওমর আলি। সে মুফতি সাবের মাদ্রাসায় পড়ালেখা করে। সে-ই কথা বললো,

'কি হইছে গিয়া হুইনো। এশার নামাজের পর মসজিদের সামনে সালিশ বইছে। চল।'

রাহেলার হাত পা অবশ হয়ে আসে। কিসের সালিশ? ইতির বাপের কথা আবারো মনে হয়। লোকটা ছোট খাটো, গুকনো মতো মানুষ, তারপরও তো স্বামী। সে থাকলে অনেক সাহস পেতো মনে। অনেক কষ্টে মনে সাহস জুগিয়ে বলে,

'পোলাপান দুইডা ঘুমাইতেছে, আমি না গেলে অয় না?'

'না গেলে অয় না? সবাই বইসা আছে, পোলাপানগুলাও নিয়া চল, ওদেরও তো দরকার।'

বলেই ওমর আলি অনেকটা গা ঠেলে ঘরে ঢুকে পরে।

'এই উঠ, উঠ'। প্রায় বগলদাবা করে ছোট মেয়েটাকে নিয়ে রওনা হয়।

'চল।'

ছেলেমেয়ে দুটো ঘুমের ঘোর ভাঙ্গার আগেই ভ্যাবাচেকা খেয়ে কেঁদে ওঠে। ওমর আলির বগলে ছটফট করে ছোট মেয়েটা। রাহেলা ছেলেটার হাত ধরে টানতে টানতে সামনে হাটতে থাকে, ঘরের দুয়ার খোলাই থাকে পেছনে। আগে ওমর আলি, তার পেছনে রাহেলা ছেলের হাত ধরে। হ্যারিকেন নিয়ে পেছনে আরেকজন। অন্ধকার গ্রামের পথে, ঝোপঝারের রহস্যে পেছনের হ্যারিকেনের আলোটাকে স্বপ্নে দেখা আগুনের ফুলকির মতো মনে হয়, মনে হয় অপার্থিব কোন ছায়া তাড়া করছে ধরতে। রাহেলা জোরে পা চালাতে থাকে।

দুই. ঝাঁঝালো মাংস, পোড়ো বিশ্বাস

প্রতিদিন সূর্য উঠলে একটাই চিন্তা মাথাচারা দিয়ে ওঠে। কি খাবে, কি খাওবাবে ছেলেমেয়ে দুটোকে। যঠর, হায়রে যঠর! চিনে চিনে ব্যথা, মোচর, কত রকমের ভাষায় জানিয়ে দেয়, খাবার দাও, খাবার দাও। তাই তো রাহেলা ভাবে, আল্লার দুনিয়ায় খাওয়া ছাড়া কি আর কোন কিছু নাই? এতো মানুষ দুনিয়ায় তারা তো কত কি করছে! কত আনন্দ, কত হাসি ঠাট্টা!! সরকার বাড়িতে গেলে মনে হয় কি উৎসব সারাদিন। সরকার চাচী মাঝে মাঝে এটা ওটা দিতেন, কখনও ছেলে মেয়ের হাতে, কখনও রাহেলার হাতে। হায়, তিনিও আর নাই এই দুনিয়ায়। সরকার বাড়ির বৌ ঝিয়েরা শহরে থাকে, এখানে আসেও না, চেয়েও দেখে না।

রাহেলা রান্নার হাড়ি নিয়ে খোঁজ করে ঘরে। জানে কিছু নাই, তাও খোঁজে। হয়তো কোথায় একটু চাল বা ডাল পাওয়া যাবে। গত একটা মাস এভাবেই চলছিল। ইতির বাপ কামলা খেটে যা আনে, তাতে মোটামুটি চলে যেত। এখন খরার সময় দিন জোয়ারি কামলা দিয়ে কিছু পাওয়ায় যায় না। সবাই বলে, ’কয়দিন দেরি করো, একটু বৃষ্টি হইলেই হাল চাষ কইরতে অইবো’। ইতির বাপ কিছুই বলতে পারে না, পারে না বলতে যে ’পেট তো কয়দিন দেরি করে না’। শেষমেষ মাস কাবারি কামলা খাটতে সোহাগপুর গ্রামে চলে গেল ইতির বাপ। ওদিকে উপজেলা আফিস, তাঁতীদের বসবাস। গৃহস্থরা তাঁতীদের জোলা বলে গাল দিলেও, ওদের হাতে টাকা আছে। ইতির বাপ বলেছিল গিয়ে প্রথম সপ্তাহ কাজ করে চাল, ডাল কিনে পাঠাবে কারো কাছে। হয়তো কোন লোক পাওয়া যায় নি এখনও। সেই পুরনো কথা ’চালায়া নিও’। আর কিভাবে চালানো যায়? ছেলেটা তারস্বরে চিৎকার করছে। মেয়েটা বুকের দুধ চুষে চুষে কিছু না পেয়েই চুপ করে আছে। ছেলেটাকে ধমকও দিতে পারে না রাহেলা।

ছেলে মেয়ে দুটোকে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে এলো রাহেলা। দেখি এপাড়া ওপাড়া করে যদি কিছু

পাওয়া যায়। গ্রামের হালট দিয়ে দক্ষিণ পাড়ার দিকে চলে এলো সে। কখন বেলা মাথার ওপর দিয়ে পার হয়ে গেছে। অবসন্ন হাত-পায়ে মেয়েটাকে কোলে নিয়ে হাটতে কষ্ট হচ্ছে। ছেলেটা আর কিছুই বলছে না। হয়তো কান্নার শক্তিও আর নাই। দক্ষিন দিকে বড় ফসলের মাঠ, তারপরে নদী। মাঠগুলো এখন শুকনো, ফাটা ফাটা। নদীর ধারটায় একটু সবুজ চোখে পরে। সেদিক থেকে ধোঁয়া উঠছে। রাহেলা সেদিকে এগিয়ে যায়, কেন যায় তাও জানে না। যেন কোথাও যাওয়ার জন্যই যাওয়া। নদীর চাতালে আসতেই রাহেলার চোখে পরে বিরাট বাথান। এই সময়টায় বাথানের লোকেরা দল বেধে শূকরগুলোকে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় ঘাস, ঘচু-কেচুর খোজে। এককেটা বাথানে কয়েক'শ শূকর। ছোট, বড় নানা রকমের। কখনও কখনও কোন গ্রামে ঘাটি করে রাত পার করে দেয় তারা। সে রকম একটা বড় বাথান ঘাঁটি করেছে নদীর ধারে। রাহেলা এগিয়ে যায় সেদিকে। ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করতে করতে শূকরগূলো মাটি খুড়ে খাবার খুঁজছে। একপাশে চুলা বানিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করেছে বাথানের লোকগুলো। সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছিল। গ্রামের পোলাপান দূরে দাড়িয়ে দেখছে। কেউ একজন বলে ওঠে,

'শূকুর মাইরছে একটা, হেইডা রাইনতেছে'

পাশে থেকে আরেকজন বলে,

'এগুলার নাম মুহে আনিস না, পাপ অইবো'।

রাহেলা কি মনে করে আরো এগিয়ে যায়। ধুতি মালকোছা করে পরে নিয়ে রান্নায় লেগে গেছে একজন। মাটি খুঁড়ে বানানো দুটো চুলা। একটাতে ভাত ফুটছে, আরেকটাতে মাংসের তরকারী। মসলার গন্ধ চারিদিকে। যে লোকটি রান্না করছে তার চোখে মুখে কি তৃপ্তি! পড়ন্ত বিকেলের রোদে, আগুনের আঁচে ঘাম জমেছে লোকটির মুখে। তবু কি তৃপ্তির সংগে গাছের শুকনো ডাল ভেঙ্গে ভেঙ্গে দিচ্ছে সে চুলার ভেতর। জানে কিছুক্ষণ পর তার সামনে পাবে গরম গরম খাবার। রাহেলার খালি পেট যেন মোচর দিয়ে ওঠে। লোকটা রান্না শেষ করে হাঁক ছাড়ে,'হে জায়সিং'। বাকি কথাগুলো বুঝতে পারে না রাহেলা। অন্য লোকটি এগিয়ে আসে খাবার খেতে। ঝোলা থেকে প্লেট বের করে ওরা। গরম ভাত প্লেটে ঢালতেই কেমন নেশা ধরানো গন্ধ ছড়ায় চারিদিকে। রাহেলা খেয়াল করে ছেলেটা সেই গরম ভাতের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। চোখ ভেজা ভেজা, তারপর ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে ছেলেটা।

'এই ছোড়া, তুমহার ভূক আছে? বেটি ইদিক আয়'। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক যে লোকটি রান্না করছিল সে রাহেলা আর ওর ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বোধহয় মায়াবোধ করে।

'তুরা তো কালা খাসি খাবে না, কি হোবে রে খেলে? আয়।'

বলে লোকটা আরেকটি প্লেটে ভাত বেড়ে দেয়, তারপর মাংসের তরকারী।

’বড় তেল ছিইল রে কালা খাসির’।

রাহেলা কিছু ভাবতে পারছে না। ছেলেটার অপলক চেয়ে থাকা, ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠা আর নিজের পেটের মোচরটা আবার অনুভব করে। ছেলেটা রাহেলার দিকে তাকিয়ে আছে। ছোট মানুষ হলেও বুঝতে পারে কিছু একটা ব্যাপার আছে যার জন্য মা খেতে চাচ্ছে না। টপ টপ করে চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে ওর গাল বেয়ে। রাহেলা চোখ সরিয়ে নেয় ছেলের চোখ থেকে। শূকরগূলো ঘোঁত ঘোঁত করে মাটি খুঁড়ে খাবার খুঁজছে। রাহেলার মাথা ঝিম ঝিম করে। মনে হয় শূকরগুলো ওর মাথা খুঁড়ে খুজছে কিছু, কেমন এলোমেলো লাগে। তারপর ছেলেটার হাত ধরে টান মেরে এগিয়ে যায় বাথানের লোকটার কাছে। খাবারের প্লেট টা হাতে নেয়। মাটিতে বসে পরে সে। গরম ভাত, লাল টকটকে মাংসের ঝাঁঝ নাকে মুখে এসে লাগে। দ্রুতহাতে তরকারি আর ভাত মাখায়, তারপর নিজের মুখে পুরলে কোন রকমের ঘেন্নার বদলে একধরনের স্বাদ অনুভব করে রাহেলা। এবার সে একমুঠো ভাত আর মাংসের টুকরো ছেলের মুখে পুরে দেয়। কোলে নিশ্চুপ মেয়েটির মুখেও কয়েক লোকমা দেয় সে। ছেলেটা কেমন গোগ্রাসে শেষ করে খাবার, নিজেও খায় ভালো করে। টের পায় একটা গুঞ্জন গ্রামের পোলাপানগুলোর ওদিক থেকে। রাহেলা ভ্রুক্ষেপও করে না। কোন কিছুই কানে ঢোকে না তার। শুধু খাওয়া শেষ হতে হতে উপলব্ধি করে বাথানের বুড়ো মতো লোকটা তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার কথাটাই একমাত্র কানে আসে রাহেলার,

’খুউব ভূক ছিল রে বেটি? হামারো তুহার মতো বেটি আছে, বহুত দুর’।

তিন. জ্বলন্ত পাথর ও ঘৃণার দহন

মসজিদের সামনে বিরাট জটলা। ওমর আলির পিছনে পিছনে আসতে আসতে রাহেলা বুঝতে পারে কেন মুফতি সাব এই রাতের বেলা ডেকে পাঠিয়েছে। রাহেলাকে নিয়ে পৌছতেই চাপা গুঞ্জন কোলাহলে পরিনত হল। কেউ একজন হ্যাজাক বাতি জ্বালিয়ে এনেছে। তার আলোয় সবার মুখ না দেখা গেলেও বোঝা যায় কারা এসেছে। একটা চেয়ারে বসে আছেন মুফতি সাব। এই রাতের বেলাতেও তার পরনে বুশ প্যান্ট শার্ট। মুফতি সাব সব সময় বলেন ’আমি সবার মতো এলেল্লা মুনসি না, আমি পড়ালেখা কইরা মুফতি হইছি।’ পোশাকে আশাকে তিনি আধুনিক থাকার চেষ্টা করেন। কোন রকম ভণিতা ছাড়াই তিনি শুর করলেন,

’সবাই থামেন। রাত অনেক হইছে। বেশি কথার সময় নাই। ইতির মাও তোমারে কেন ডাকা হইছে

জানো?

রাহেলা মাথা নিচু করে চুপ করে থাকে।

’চুপ থাকলে তো অইবো না। তুমি আইজকা বাথানে গিয়া মুচি গো সঙ্গে ভাত খাইছো তাও আবার শূকুরের মাংস দিয়া। তুমি নিজেও খাইছো, পোলাপানগোরেও খাওয়াইছো। মহা পাপ করছো তুমি। মুসলমানের কাজ করো নাই। অহন কও এগুলা করছো কি না?’

রাহেলা তাও চুপ করে থাকে। কী বা বলবে সে?

’আমাদের ধৈর্যহারা কইরো না, উওর দাও’।

’জ্বী খাইছি’। রাহেলা এটুকু বলতেই গুঞ্জন ওঠে আবার। মুফতি সাব হাত তুলে থামায় সাবাইকে।

’কেন খাইছো? কোরান পাকে আছে জান বাঁচানো ফরজ, জান বাঁচাইতে খায়া থাকলে জায়েজ আছে। জান বাঁচাইতে খাইছো?’

সেই আগের মতোই নিশ্চুপ থাকে রাহেলা। মুফতি সাব অধৈর্যের স্বরে আবার বলে,

’কি, জান বাঁচাইতে খাইছো?’

’হ্যা’। কোনমতে উত্তর দেয় রাহেলা।

’কেমন মিথ্যা কথা বলে! জান বাঁচানোর হইলে আগে আমাগোরে কাছে আইতা, নবী করিম (সঃ) একরম কত ঘটনা নসিয়ৎ করছেন, হারাম না খায়া বাঁচনের চেষ্টা করছো আগে? কি কথা কও না ক্যা?’

রাহেলা মাথা নিচু করে চুপ থাকে। মুফতি সাব অর্ধৈয্য হয়ে পরে। সালিশের ভিড়ের ভেতর থেকে কেউ একজন ফোরন কাটে ’মাইরের ওপর অষুধ নাই’। রাহেলা এবার মুখ খোলে,

’আপনার কাছ থেইক্যাই তো হুনছি নিজে খাওয়ার সময় শরিকের কেউ না খায়া আছে কিনা খোঁজ নিতে বলছেন আমাদের নবী, কেউ তো খোঁজ নেয় না’।

’ভালোই তো কথার পিঠে কথা শিখছো ইতির মাও। নিজেও পাপ করছো, নিজের পোলা মাইয়াকেও করাইছো। ওরা নাবালক, ওদের পাপও তোমার ঘারে। তোমার মান ইজ্জত, ধর্ম কর্মের ভয় নাই?’ হারাম খাইছো তুমি।’

’খিদা পেটে ছেলেটা মরতে বসছিল, কি করমু হারাম না খায়া? কত মানূষই তো হারাম রোজগারের ভাত মাংস খায়, তাগোর তো বিচার অয় না।’

’আবার মিথ্যা কথা কও! একদিন উপাস থাকলে কেউ মরে না। তাছাড়া কার বিচার অইবো না অইবো হেগুলা তোমার দেখতে হবে না। তুমি তওবা করবা সবার সামনে আর বাঁশের কঞ্চির সাত ঘা,

ছেলে-মেয়ে দুইটার জন্য সাত দুগুনে দৌদ্দ মোট একুশ ঘা খাইবা। কারো কিছু কওয়ার আছে?'

বুড়ো মফিজ মুনসী সায় দেয়,

'মুফতি সাব হক বিচার হইছে, অপরাধের তুলনায় একটু কমই হইলো, কি আর করা।'

'নেও ইতির মা, আমার সঙ্গে সঙ্গে তওবা পড়ো, তওবা তওবা ওয়াস্তাকফিরুল্লা রাব্বি মিনকুল্লে...'

রাহেলার মনেও এক ধরনের ভয় কাজ করে, সে বিড় বিড় করে মুফতির সঙ্গে বলতে থাকে তওবা তওবা ওয়াস্তাকফিরুল্লা.....। তওবা শেষে মুফতি সাব ওমর আলিকে ডাকে,

'বাঁশের কঞ্চি আনো, মেয়েলোক কে বে আব্রু করার দরকার নাই। কাপড়ের উপর দিয়াই পিঠে একুশ ঘা লাগাও।'

ওমর আলি বাঁশের কঞ্চি নিয়ে আসে। প্রথম ঘা পড়তেই চিকন ধারালো ব্যথা শিড়দারা বেয়ে নামে। রাহেলা আহ করে শব্দ করে। ছেলেটা কেঁদে ওঠে। ওমর আলি গুনে গুনে মারতে থাকে রাহেলার পিঠে, কয়েকবার ব্যথার পর রাহেলা আর টের পায় না কিছু। ব্যথায় অবশ পিঠ, শিড়দারা। মেয়েটা মাটিতে গড়াগড়ি যায়, তোলার শক্তিও পায় না। ওমর আলি কুড়ি গোনার সঙ্গে সঙ্গে মুফতি সাব থামতে বলে।

'খারা, এই একটা ঘা ওই ছেলের হাতে মার, ছেলে নাবালক হইলেও একেবারে ছোট না। ওরও শিক্ষাটা মনে থাকা দরকার।'

একথায় রাহেলা চেঁচিয়ে ওঠে,

'না! পাপ যা হইছে, আমার হইছে। আমার ছেলের গায়ে হাত দিবেন না।'

রাহেলার গলায় কি জানি ছিল; ওমর আলি থমকে মুফতি সাবের দিকে তাকায়। মুফতি মাথা নেড়ে ইশারা করে। ওমর আলি বলে,

'হাত পাত'।

কাঁদতে কাঁদতেই ভয়ে হাত পাতে ছেলেটা আর ওমর আলি বাঁশের কঞ্চি দিয়ে মারে। রাহেলার কি জানি হয়। আবার সে শূকরগুলোর ঘোঁত ঘোঁত শব্দে মাটি খোঁড়ার দৃশ্য দেখতে পায়। মাথাটা এলোমেলো লাগে, মনে হয় শূকরগুলো ঘোঁত ঘোঁত শব্দে ওর নিজের মাথায় আতিপাতি করে খুঁজছে কিছু। রাহেলা উন্মাদের মতো মুফতির পাশে বসে থাকা মুফতির ছোট ছেলেটার ওপর ঝাপিয়ে পরে। চড় কষায় তার গালে। মুহূর্তে ঘটে যায় এসব। মুফতি লাফিয়ে ওঠে চেয়ার থেকে।

'হারামজাদি, এতো বড় সাহস। আমার ছেলের গায়ে হাত দিছোস, হারামখাকি।'

বলেই দৌড়ে এসে রাহেলার চুলের মুঠি ধরে টানে।

’ওমর আলি, কেচি আন। হারামখাকিরে আইজ নাইরা কইরা মাথায় ঘোল ঢালমু’
ওমর আলি করিৎ কর্মার মত কোথা থেকে কেচি নিয়ে আসে। মুফতি নিজ হাতে রাহেলার চুল ধরে গুছি করে কাটতে শুরু করে। চারিদিকে গুঞ্জন ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। মুফতির বিরুদ্ধেও কেউ কিছু বলার সাহস করে না। যেন বিচারের বাইরি মুফতির ছেলেকে মেরে রাহেলাই বেশি আন্যায় করেছে। রাহেলাকে আলুথালু বেশে পাগলের মতো লাগে। মাথার ভিতরে আবারো শূকরগুলোর ঘোঁত ঘোঁত শব্দ শুনতে পায় সে। কেটে ফেলা চুলগুলো মুখে এসে লাগে। শুধু কানে ভাসে ছেলেটা আর মেয়েটার চিৎকার।

চারপাশে কোন মানুষজন দেখতে পায় না রাহেলা। শুধু কুয়াশায় ঢাকা দিগন্ত চরাচর। সামনে অতি উচু আসনে কেউ বিচারকের ভঙ্গিতে বসে। তার মুখ দেখা যায় না। রাহেলাকে দাড় করিয়ে দেয়া হয়েছে একটা গরম পাথরের ওপর। একি হাশরের মাঠ? বিচার হচ্ছে তার? বিচারক গমগমে সুরে বললেন, ’বল কি কি খেয়েছিস?’ পায়ের পাতায় গরম পাথরের ছ্যাকা লাগে। তবে কি মক্তবে শেখা সেই হাশরের মাঠের বিচারের দিন এটা? যারা নেক বান্দা নয় গরম পাথরের উত্তাপে মাথার মগজ গলে বের হয়ে যাবে তাদের। রাহেলা প্রাণপণে বলার চেষ্টা করে, ’আমি ভাত মাংস খাইছি, আর কিছু না’। কিন্তু পারে না কিছু বলতে। পায়ের নিচে উত্তাপ আরো বেড়ে যাচ্ছে। রাহেলা বুঝতে পারে আর কোন উপায় নেই। মাথার ভিতরে আবারো শুকরগুলোর ঘোঁত ঘোঁত শব্দ শুনতে পায় সে, খুঁড়ে যাচ্ছে কিছু। বমি বমি ভাব আসে। আর তখনই মনে হয় এই তো বাঁচার উপায়! রাহেলা প্রাণপণে শরীরের ভেতর থেকে সব উগরে বের করে নিয়ে আসতে চেষ্টা করে, যঠরের সমস্ত ঘৃণা দলাপাকা বমি হয়ে বের হয়ে আসে। মাথা নিচু করে লাল পাথরটাকে তাক করে রাহেলা। অফুরন্ত বমির জোয়ারে উত্তপ্ত পাথরের আগুন নিভে আসে ক্রমশ। রাহেলা দুহাত আকাশের দিকে ভাসিয়ে ভাবে বেঁচে আছে সে, বেঁচে আছে সে আর চিৎকার করে বলতে থাকে
’আমি হারাম উগরাইতাছি না, ঘেন্না উগরাইতাছি, ঘেন্না’,
তারপর লুটিয়ে পরে মাটির কোলে।